চন্দ্রলেখা

অদ্রীশ বর্ধন

আজ ইস্টার সানডে। দার্জিলিং যেন হাসছে।

গোর্খাল্যাণ্ডের গণ্ডগোল এখন দুঃস্বপ্নময় অতীত। বছর দুই বড় ঝাপটে গেছে। কত হোটেল যে বন্ধ হয়ে গেল, কত টুরিস্ট কোয়ার্টার বিক্রী হয়ে গেল, কে তার হিসেব রাখে।

রতন সামন্ত কিন্তু সামাল দিয়ে গেছে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। জলে থাকতে গেলে কুমিরের সঙ্গে ভাবসাব রাখতে হয়। এই সোজা বুদ্ধিটা তার আছে। ফলে, বহুজনের মুণ্ড যখন গড়াগড়ি গেছে, রতন সামন্ত তখন মাথা উঁচু করে ম্যাল থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত নির্ভয়ে টহল দিয়েছে।

অথচ গোর্খারা তাকে জানে বাঙালী বলেই। বাঙালীত্ব তার চেহারায়। কিন্তু কথায় আর কায়দায় সে ষোলআনা গোর্খা।

অনেকদিন পর আজ তার পাবলিক হাউস গমগম করছে। লোকজনের ভিড়ে দার্জিলিং যে আবার ফেটে পড়ছে। আগেই চাইতে বরং বেশি। বিধ্বস্ত দার্জিলিংকে দেখার হুজুগ উঠেছে সমতলে। শুধু কলকাতা নয়। ভারতের নানা জায়গা থেকে টুরিস্ট আসছে।

দার্জিলিং তাই এখন সরগরম। পূর্ণিমা তো গেল এই সেদিন। সে রাতে যেন রুপোর মুকুট মাথায় দিয়ে বসেছিল পাহাড়ের রাণী দার্জিলিং। এত আলো জ্বলেছে পথেঘাটে ঘরে ঘরে যে দূর থেকে মনে হয়েছে যেন, অজস্র রত্ন চিকমিক করছে রজত-মুকুটে।

চাঁদ এখনও হাসছে ঝকঝকে আকাশে। সমতলের স্কুলে ছুটি শুরু হয়ে গেছে। এখনই তো শৈলাবাসে দিনকয়েক থেকে আসার সময়।

গোর্খাদের সাধের শহর দার্জিলিংও তাই হাসছে।

হাসছে আমাদের রতন সামন্তও। আবার আগের মত তার সেলুন বার-এর কাউন্টারে ভিড় জমেছে। আগের মতই বোতল খোলা হচ্ছে। গেলাসে মদিরা ঢালা হচ্ছে। রতনের পেছনে দেওয়ালের টানা লম্বা তাকে সারি সারি সাজানো দিশি বিলিতি সুরা। তার এই 'ব্লু-বটল' পানাগারে যাবতীয় সুরা পাওয়া যায়। এ তথ্য ঝানু পর্যটকরা জেনে গেছে অনেক আগেই।

হেসে হেসেই সবাইকে আপ্যায়ন করে যাচ্ছে রতন। তার মুখ দেখলে বয়স আঁচ করা কঠিন। চোখ-দুটো সদাঝিকমিকে। শ্যাম্পু করা চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে চিমটি কাটলেও আঙুলে ধরা যায় না। তার চোখা নাকের নিচে মোটা গোঁফ এ কালে অচল। অথচ ওই গোঁফই তার মুখমণ্ডলে এনে দিয়েছে দারুণ ব্যক্তিত্ব।

রতন ফর্সা। নিদারুণ ফর্সা। নিন্দুকরা বলে নাকি, নিদারুণ ফর্সা নেপালিনী বউকে ঘরে তোলার পর থেকেই রতনের রঙ আরও খোলতাই হয়েছে।

রতনের এই টুকটুকে বউটিও রয়েছে এখন পাবলিক হাউসে। সে টেবিলে টেবিলে ঘোরে না। কাউন্টারের পেছনে থেকে রতনকে বোতল এগিয়ে দেয় আর অনর্গল হেসে যায়।

এত হাসতেও পারে কাঞ্চী। কনভেন্টে পড়া মেয়ে তো। স্ক্রি মিক্সিংটা জানে ভালভাবেই। নাক চ্যাপ্টা হলে কি হবে, টুকটুকে লাল ঠোঁট আর ঝিকিমিকি পারিপাটি দাঁতের বাহার দেখিয়ে খদ্দেরদের মনে রঙ ধরিয়ে দিতে পারে চক্ষের নিমেষে। সোনালী ফ্রেমের বড় বড় কাঁচের আড়ালে নরুণ চেরা চোখদুটোয় হাসি যেন ফেটে ফেটে পড়ছে অষ্টপ্রহর। হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা —তিনটে ভাষাতেই বুকনিতে সে পরম পোক্ত। গায়ে তার সোনালী হাত-

কাটা ব্লাউজ আর রুপোলী স্কার্ট। কোমরবন্ধনীটা মিশমিশে কালো ভেল-ভেটের। বাঁহাতে কোয়ার্জ ঘড়ি।

রতন যেমন অতিথি আপ্যায়নের ফাঁকে ফাঁকে চকিত উৎকণ্ঠায় কাচের দরজার ওপারে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, কাঞ্চীও ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।

কেননা, চন্দ্রলেখা এখনও এসে পৌঁছোয় নি।

চন্দ্রলেখা যে এই ব্লু-বটল প্রমোদালয়ের মূল আকর্ষণ। তাকে দেখলে বুকের রক্ত ছলকে ওঠে না, এমন পুরুষ ধরায় আছে কিনা সন্দেহ। সে যখন হাঁটে, তখন যেন অদৃশ্য নূপুর শিঞ্জিত হয়; সে যখন হাসে, তখন নূপুর-ধ্বনি যেন ঝুনঝুন শব্দে মগজের লক্ষ কোটি কোষে তান আর লয় সৃষ্টি করে চলে; সে যখন তাকায়, তখন যেন রক্তের বারুদে আগুন ধরে যায়।

চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা! বিধাতা তাকে অসীম যত্নে গড়েছিলেন। পরিপাটি করেছিলেন তার তন্বী দেহটিকে! সে দেহের কোথাও কোন খুঁত রাখেন নি—কামিনীকে কেন যে দামিনী বলা হয়, চন্দ্রলেখা তার প্রমাণ।

চন্দ্রলেখার অতীত বড় রহস্যময়। বড় দুর্যোগময়। বিধাতা তার রক্ত-মাংসের শরীরটাকে নরম-কোমল লোভনীয় করে তুলেছিলেন, কিন্তু হৃদয়টাকে পাথর দিয়ে গড়েছিলেন।

চন্দ্রলেখা এই রক্তাক্ত কাহিনীর প্রথম এবং প্রধান চরিত্র।

কিন্তু সে এখন কোথায়?

*

রঘু রাহাও খুঁজেছিল তাকে।

তখন তার চোখে দেখা গেছিল উৎকণ্ঠা। ভয়।

চন্দ্রলেখাকে ভয়? তাকে দেখলেই তো আনন্দ হয়। সুন্দরীদের দেখলে কোন্ পুরুষের মন-ময়ূর পেখম মেলে ধরে না?

অথচ চন্দ্রলেখাকে ব্লু-বটলের আনাচে কানাচে দেখতে না পেয়ে বড়ই স্বস্তি পেয়েছিল রঘু রাহা। তার বালকসুলভ মুখখানা স্বস্তিবোধে ঝকঝকিয়ে উঠেছিল। পেশীগুলো আর আড়ষ্ট হয়ে থাকেনি—নিশ্চিন্ত শিথিলতায় মনের আনন্দকে মুখে ফুটিয়ে তুলেছিল।

চন্দ্রলেখা···সুন্দরী সেক্স-বোমা চন্দ্রলেখা···এই মুহূর্তে একটা ভয়ানক আতঙ্ক তার কাছে।

৪. ব্লু-বট্‌ল পানাগার তখন কোলাহল আর কলরবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ইংরিজী আর হিন্দী ফিল্মের নায়ক আর নায়িকাদের অনুকরণে রঙচঙে এবং অদ্ভুত উদ্ভট কাটিং-এর পোশাক গায়ে চাপিয়ে হেসে হেসে নেচে নেচে কত কথাই না বলে চলেছে যৌবন-মদে মাতাল যুবক আর যুবতীরা। তাদের কথায় নেই কোনো বাঁধুনি, নেই বিশেষ বিষয়। গায়ে গা দিয়ে, চোখে চোখ রেখে, ইশারায়-ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছে আসল কথাগুলো—যে সব কথা অনুক্ত থাকাই ভাল—কিন্তু টুকরো হাসি আর স্খলিত বচনে সরবে যা বলে চলেছে তা নিতান্তই অর্থহীন।

ছেলেদের আলোচনা নারী আর গাড়ি নিয়ে। নতুন মডেলের মেয়ে আর নতুন মডেলের গাড়ি এদের ধ্যান-ধারণা জুড়ে রয়েছে। গাড়ি যাদের আয়ত্তের বাইরে, তারা মোটর সাইকেলের লম্বা চওড়া গল্প চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোন মডেলের মেয়েটিকে ক'বার পেছনে বসিয়ে সজোরে ব্রেক কষে পিঠে হুমড়ি খাইয়েছে—তার সরস বর্ণনায় মুখর হয়ে রয়েছে।

চকমকি চোখে আড়ে আড়ে তাকিয়ে মেয়েগুলো তাই শুনছে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কথা আর হাসি এদের গলা দিয়ে পাহাড়ি ঝর্ণার মত-ভেড়ে-ফুঁড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে।

টেবিলে টেবিলে চলছে এই কাণ্ড। মদন দেবতা আর রতিদেবীর বড় সমাদর এই ব্লু-বটল পানাগারে।

ঘরটা বিরাট। পাহাড়ের কিনারায় যেন ঝুলছে। একদিকের জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যায় বহু নিচের আলোগুলো। পাহাড়ি পথ এঁকে বেঁকে নেমে গেছে নিচে··· নিচে···আরো নিচে। আলো জ্বলছে পথে পথে—ঘরে ঘরে—দোকানে বাজারে।

দার্জিলিং আজ হাসছে। আজ যে ইস্টার মানডে!

কোণের জানলাটার কাছে বসে এক মনে সারা ঘরের ছবিগুলোকে কাগজের বুকে এঁকে চলেছে এক শিল্পী। বয়স তার বোঝা মুশকিল। লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে মুখের দু-পাশ দিয়ে বুকের ওপর। গালে আর চিবুকে বুঝি ছোটখাট আফ্রিকা গজিয়ে গেছে। ইয়ামোটা কালো ফ্রেমের ঈষৎ নীলাভ চশমার কাঁচের আড়ালে যত রাজ্যের স্বপ্ন পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে চলেছে তার দুই চোখে।

সে দেখছে আর আঁকছে। আঁকছে আর দেখছে। সাদা কাশ্মীরি শাল গা থেকে খসে পড়লে মাঝে মাঝে এক হাতে তুলে ফের গায়ে জড়িয়ে নিচে। টেবিলের তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার পরণে রয়েছে সাদা সিল্কের পায়জামা, আর পায়ে সাদা দুধের মত চামড়ার চটি।

রঘু রাহাকে ইতিউতি তাকাতে দেখেই নেচে উঠেছিল শিল্পী মহাশয়ের স্বপ্নিল চক্ষু। ছোট্ট আফ্রিকার আড়ালে দেখা গেছিল সাদা দাঁতের হাসি।

বলেছিল সোল্লাসে—আরে! আরে! রঘুবাবু যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?

ঠিক এই সময়ে ইলেকট্রনিক মিউজিক শুরু করে দিয়েছিল খুশি-উচ্ছল যৌবন-মাতাল ছেলেমেয়েরা। তালে তালে ঝাঁকিয়ে চলেছিল শরীরগুলোকে। ব্রেকডান্স। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—কিন্তু কামনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয় প্রতিটি লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায়।

অকস্মাৎ ফেটে পড়া সেই উল্লোলধ্বনি ছাপিয়ে শিল্পীর আহ্বান গিয়ে পৌঁছেছিল রঘু রাহার কানে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তৎক্ষণাৎ। গালে কালো আঁচিল, ঠোঁটে রুপোলি রঙ আর নীলাভ চক্ষুপল্লবে অপরূপা একটি যৌবনবতী সেই মুহূর্তে টাইট স্ল্যাক্স আঁটা নিতম্ব হিল্লোল দেখিয়ে গেছিল তার সামনে। সেই সঙ্গে লাস্যময় কটাক্ষ আর ঝঙ্কারময় আহ্বান—"হেই রঘু! কাম, ড্যান্স উইথ মী!"

রঘু সেদিকে তাকায়নি। বালকসুলভ মুখটাতে ছেলেমানুষী হাসি ফুটিয়ে শিল্পীর পানে ক্ষণেক চেয়ে থেকেই লম্বা লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে গেছিল কোণের টেবিলটার দিকে।

আঁকার সরঞ্জাম টেবিলে ফেলে দিয়ে রঘুর পানে দু-হাত বাড়িয়ে বলে ওঠে উজ্জ্বলে শিল্পী—"ব্যাপারটা কী? গাড়ির কারবার কি এখানেও?"

রঘু ততক্ষণে এসে গেছে শিল্পীর সামনে। চেয়ার টেনে নিয়েছে স্মার্টলি। মাথার ওপরকার বহুরঙা হালফ্যাশনের ঝাড়লণ্ঠনের সাইকেডেলিক আলোক-ধারা ক্ষণে ক্ষণে রামধনু সৃষ্টি করে চলেছে তার চামড়ার জ্যাকেটে। ছেলে-মানুষী হাসিতে বড় নিষ্পাপ মনে হচ্ছে তাকে—এই মুহূর্তে। অবাক চাহনি দেখে কে বলবে বয়স তাঁর পঁচিশ। এভাবে চোখ বড় বড় করে ফেলার অভ্যাস তার ছিল ছেলেবেলায়—রয়ে গেছে এখনও।

এবং এইটাই তার মূলধন। যেমন মূলধন তার এই গোঁফজোড়া। মুখের

...ভাবটা ঢাকবার প্রয়াসেই সে গোঁফ রেখেছে এমন অদ্ভুত গড়নে। চওড়ায় ...ইঞ্চির কম নয়—বেশিও নয়। নাকের তলা দিয়ে দু-পাশে ইঞ্চি তিনেক প্র...রিত হয়েই সহসা ঝুলে পড়েছে চোয়ালের দিকে ইঞ্চি দেড়েক।

আশ্চর্য এই গোঁফ নেচে নেচে উঠল শিল্পী মশায়ের সাদর সম্ভাষণের জবাব দিতে গিয়ে—"আস্তিকবাবু! এখানে?"

"আস্তিক লাহার যাবার কোথাও ঠিক আছে?" হুইস্কির বোতল আর গেলাস এগিয়ে দিতে দিতে বললে শিল্পী—"প্রশ্নের জবাব খুঁজতে যেখানে মন চায়, সেখানেই যাবো।"

"প্রশ্ন তো আপনার অনেক, আস্তিকবাবু," গেলাসে টুক করে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বললে রঘু রাহা—"এই মুহূর্তে মাথায় চাড়া দিয়েছে কোনটা?"

সঙ্গে সঙ্গে উন্মনা হয়ে গেল শিল্পী আস্তিক লাহা। নীলাভ কাঁচের আড়ালে বড়ই উদাস আর দূরপ্রসারী হয়ে যায় আশ্চর্য-সুন্দর চোখদুটো। রঘু রাহা সকৌতুকে মোটা গোঁফ নাচিয়ে অপরূপ ওই চক্ষুযুগলের মধ্যেই যেন অন্বেষণ করতে থাকে পাগলামির কালো ছায়াকে।

কারণ, আস্তিক লাহা বদ্ধ পাগল নাহলেও কিছুটা পাগল। বায়ুরোগে আচ্ছন্ন। সমাজ তবুও তাকে ভালবাসে। তার এই বায়ুরোগ নিয়ে মজা করে।

নিরীহ মুখে ফের বলে রঘু রাহা—"বলুন না কোন প্রশ্নটা কাহিল করছে আপনাকে এক্ষুণি?"

সত্যিই উদভ্রান্তির মেঘ ঘনিয়ে ওঠে আস্তিক লাহার অস্পষ্ট চোখের তারায় তারায়।

বললে অস্ফুট কণ্ঠে—"রঘুবাবু, আজও তো কেউ বলতে পারল না, তাল গাছ কেন লম্বা হয়, বেঁটে কেন পেয়ারা গাছ?"

"অথবা তিমি কেন বিরাট হয়, ক্ষুদে কেন চিংড়ি?"

"ঠিক! ঠিক! অথবা দেখুন, ছুরি দেখলেই কেন মনে হয় কুচি কুচি করে কাটছি আমার বউকে?"

কৌতুক সরে যায় রঘু রাহার চোখ মুখ থেকে নিমেষের মধ্যে। বলে সহানুভূতি মাখানো স্বরে—"এটা আপনার ভুল চিন্তা আস্তিকবাবু।"

"ভুল!" পলকের মধ্যে জ্বলে ওঠে আস্তিক লাহা—"ভুল— ভুল চিন্তা! আপনি বলতে চান এটা চিন্তার রোগ? আমি সিজোফ্রেনিক রুগী? পাগল

প্রমাদ গোনে রঘু রাহা —"কি যে বলেন! আপনার দরের শিল্পীকে পাগলা গারদে কে পাঠাবে?"

"চেষ্টা করেছিল মশাই, সে চেষ্টাও করেছিল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। বউ মরে গেল রেললাইনে—আর আমার খালি মনে হতে লাগল দুনিয়ার যত ছুরি কাঁচি বঁটি ক্ষুর দিয়ে বউটাকে কুচিকুচি করে কাটছি—আমি জানি—আমি জানি এটা আমার বাজে ভাবনা—কিন্তু মন থেকে তো তাড়াতে পারছি না—তার জন্যে পাগলা গারদে যাবো কেন?"

"কখনো যাবেন না। কিসের দুঃখ আপনার? আর একটা বিয়ে করলেই—"

"বিয়ে!" চমকে ওঠে আস্তিক লাহা। নীল চশমার আড়ালে কালো চোখ দুটো বাস্তবিকই আঁৎকে ওঠে—"আবার বিয়ে! হিলহিলে কিলবিলে মেয়েগুলোকে দেখলেই মনে হয় ফণা তুলে নেচে নেচে যাচ্ছে সাপের দল। এই দেখুন না—দেখুন—ওই ছবিই তো আঁকছিলাম এতক্ষণ।"

ছবির কাগজ রঘু রাহার দিকে ঘুরিয়ে দেয় আস্তিক লাহা। কাগজের এদিক থেকে সেদিকে লম্বা লম্বা সাপের নানা ভঙ্গিমার ছবি। সাপের লুডো বললেই চলে। প্রতিটি সরীসৃপের মুখটা মানুষ-সুন্দরীর!

বিস্ফারিত চোখে এই ছবি পলকের জন্যে নিরীক্ষণ করেই বলে উঠল রঘু রাহা—"ঠিকই এঁকেছেন। এরা সব সাপ। নাগিনীর দল! খবরদার, আর বিয়ে করবেন না।"

"পাগল! তবুও কি জানেন," মুখটা অকস্মাৎ করুণ হয়ে আসে আস্তিক লাহার—"মিটমিটে চটপটে খুটখুটে মেয়েগুলোকে দেখলেই শরীরটা বেশ চনমনে ঝনঝনে হনহনে হয়ে ওঠে। তাই এসে বসে থাকি।"

"নিজেকে তখন বেশ মুচমুচে ফুরফুরে তরতাজা মনে হয়, তাই না?"

"ঠিক! ঠিক! ওইজন্যেই তো ভাবলাম ইস্টার সানডে-টা কাটিয়ে যাই দার্জিলিং-এ। কিন্তু আপনি ক্যালকাটা ছেড়ে পাহাড়ের টঙে উঠে এসেছেন কেন, রঘুবাবু? গাড়ির খদ্দের পেয়েছেন?"

"পাবো।" হাসে রঘু রাহা। মাপা হাসি। সারল্যটা ক্ষণেকের জন্যে স্তিমিত— "বেশ কটা পার্টি এখানেই এসেছে মাসখানেক আগে। গাড়ি বেচবে অনেকগুলো। স্ট্যাণ্ডার্ড টু থাউজ্যাণ্ড, মারুতি আর কনটেসা কেনার হিড়িক

উঠেছে যে! দাঁও পেটার এই তো সময়—আজ চলি," বলেই চোঁ করে গেলাস শেষ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রঘু রাহা।

"আবার আসবেন। সন্ধ্যের পরেই পাবেন এখানে। সাপগুলো তার আগে তো আসে না।"

"আসবো," বলে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায় রঘু রাহা ব্রেক ড্যান্সারদের আশপাশ দিয়ে।

নির্নিমেষে সেদিকে চেয়ে থাকে পাগল শিল্পী আস্তিক লাহা। মুখ এখন তার গম্ভীর। চশমার আড়ালে ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, চোখের তারা গোল গোল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষদের চোখ অনেকটা এই রকমই হয়।

বিড় বিড় করছে আপন মনে—"তাল গাছ কেন লম্বা, সুপুরি গাছ বেঁটে? আফ্রিকায় কেন গরম, দার্জিলিং-এ ঠাণ্ডা? পাতিলেবু কেন সবুজ, কমলালেবু কমলা?—দূর! যত্তোসব অপোগণ্ড চিন্তা! জবাব দিতে পারে না—মাথায় ঘুরছে ঘুর ঘুর করে! দূর হ! দূর হ! দূর হ!"

কিন্তু মন টানছে না আর ছবির দিকে। সাপের ছবিগুলো যতই তেড়াবেঁকা হোক না কেন—সাপ তো বটে। সাপ আঁকা সবচেয়ে সোজা বলেই এদেরকেই আঁকা শুরু করেছে আস্তিক লাহা। তেরো থেকে তেইশের মেয়েদের ঝাঁকামি দেখলেই কেন যে হাত সুড়সুড় করে ওঠে, কেন যে ওরা সর্পাকৃতি হয়ে স্কেচপেনের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসে—এ রহস্য আজও রহস্য স্বয়ং আস্তিক লাহার কাছেও।

স্কেচপেন দিয়ে কান খুঁটতে খুঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল আস্তিকবাবু। জগঝম্প বাজনায় কানের পর্দা বুঝি এখুনি পটাং করে ফেটে যাবে। মেয়ে আর ছেলেগুলো যেভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, ধনুষ্টংকার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শির-দাঁড়ার হাড় না সরে যায়। স্পনডিলোসিস অনিবার্য।

রঘু রাহা বেশ আছে। গাড়ির দালালী করেই টু-পাইস কামাচ্ছে। খুব ফুর্তিবাজ। মেয়েরা ওকে পছন্দ করে ওর ওই সরল নিষ্পাপ নির্বিষ চাহনির জন্যে। যখন তখন নতুন নতুন মডেলের গাড়ি চড়তেও পায়।

কিন্তু রঘু কাউন্টারের সামনে কার সঙ্গে কথা বলছে? আস্তিক লাহাকে দেখাচ্ছে ছোঁড়াটা। কি যেন জিজ্ঞেস করছে রঘুকে, রঘু তার জবাবও দিচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে ওঠে শিল্পী মশায়ের। নিশ্চয় ওর পাগলামি নিয়ে কথা হচ্ছে।

উশখুশ করে ওঠে ভেতরটা।

*

রঘু যার সঙ্গে কথা বলছে আস্তিক লাহাকে দেখিয়ে দেখিয়ে, নাম তার সুবিনয়। মর্কুটে চেহারা। চোখদুটোও কোটরে ঢোকানো এবং বোতামের মত গোল গোল। গালের হাড় উঁচু। রোগা প্যাকাটি। মুখে মাংসই নেই বললে চলে। শুধু কালচে চামড়া সেঁটে রয়েছে হাড়ের সঙ্গে। চুলের বাহার কিন্তু আছে। এখনও সে হিপপকেট থেকে চিরুনী বের করে আঁচড়াচ্ছে। বয়স পঁচিশও ছাড়ায়নি। মুখে মাখানো অনিয়ম অত্যাচারের ছাপ। রঘুর মতই কালো চামড়ার জ্যাকেট পরে রোগা শরীরটাকে ফুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো এর অভ্যেস।

সুপুরুষ নয় সে একেবারেই। রঘুর সঙ্গে লাইন করেছে দালালী করে দু-পয়সা আমদানীর প্রচেষ্টায়।

আস্তিক লাহাকে দেখিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিল সুবনয়—"জংলীর মত লোকটা কে রে?"

রঘু বলেছিল—"আস্তিক লাহা।"

"তোর পার্টি নাকি?"

"পার্টি তো বটেই। মাসকয়েক হল আলাপ হয়েছে কলকাতায়। মাথার রোগ আছে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে—সে টাকায় ছাতলা পড়ে যাচ্ছে—তবুও গাড়ি কিনবে না।"

"কেন?"

"গাড়ি চাপলেই মনে হয় কেউ চাপা পড়ে গেল। হেঁটে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যাবে—পা গুনে গুনে!"

"পা গুনে গুনে!"

"অবসেসন আর কমপালসন দুটোতেই ভুগছে। সিজোফ্রেনিয়া। চিন্তা মানেই বিকৃত চিন্তা। পরে আলাপ করবি। মজার লোক। বোতলগুলো নিয়েছিস?"

"কটা বোতল নিবি, তাই তো বললি না?"

"ডজনখানেক নে। কই হে রতনবাবু, দাও না বারোটা বীয়ার।"

রতন সামন্তর মসৃণ দুই চক্ষু পিছলে পিছলে গিয়ে দেখছিল ঘরের প্রতিটি

ব্যবসা। বেলেল্লাপনায় বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। ছেলে আর মেয়ে ছাড়া কারবার চলবেই না। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো মাঝে মধ্যে এমন লটঘট কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে—

রঘুর কথাটা কানে ঢুকেছে ঠিকই। স্কেল দিয়ে মাপা আদিখ্যেতা হাসিও হেসেছে। পুরু প্ল্যাষ্টিক ব্যাগে ঠন্‌ঠন্ শব্দে বারোটা বীয়ারের বোতল সাজিয়ে তুলে দিয়েছে রঘুর হাতে।

দাম মিটিয়ে দিয়ে রঘু আর সুবিনয় যখন কাঁচের দরজার দিকে এগোচ্ছে, তখন কাঞ্চী হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। দুই চোখে চাপা উদ্বেগ। অথচ এরই মধ্যে হেসে হেসে কথাও বলে যেতে হচ্ছে খদ্দেরদের সঙ্গে।

চন্দ্রলেখা তো কখনও এত দেরী করে না। রাত নটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি!

আস্তিক লাহাও দুই লোমশ ভুরুর মাঝখানকার চামড়াকে তিন ভাঁজ করে চেয়েছিল এদের দিকে। বিড়বিড় করে বকেই যাচ্ছে আপন মনে—"চাঁদ কেন নরম হয়, সূর্য কেন গরম? ধুত্তোর। হেঁটে আসি একটু রাস্তায়।"

কাঁধের ঝোলা পড়েছিল, পাশের চেয়ারে। রঙিন কাপড়ের কাঁধ-ব্যাগ। স্কেচপেন আর কাগজ তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই খেয়াল হল, হুইস্কির বোতল এখনও শেষ হয়নি।

বোতল তুলে ধরল চোখের সামনে। চোখ কুঁচকে দেখছে তরল অগ্নিকে। বলছে বিড়বিড় করে—"মদ কেন স্থির—মানুষ কেন অস্থির? যা—যা—গোল্লায় যা!"

সামনের টেবিলে যে কপোত-কপোতী চকচকে চোখে দেখছিল আস্তিকের কীর্তি, তাদেরই সামনে বোতলটা ঠক্ করে বসিয়ে দিয়ে বললে আস্তিক—"গুড নাইট! এনজয় মাই ফ্রেণ্ডস্!"

তাজ্জব ছেলেমেয়ে দুটিকে আর কথা বলতে না দিয়ে কাঁচের দরজার দিকে পা বাড়ায় আস্তিক।

রঘু আর সুবিনয় ততক্ষণে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেছে।

সোনারঙের কোয়ার্জ ঘড়িটার ডায়ালে উদ্বেগমাখা দৃষ্টি আর একবার নিক্ষেপ করেছে কাঞ্চী।

ঠিক তখনি পিস্তল-নির্ঘোষের শব্দ দুটো ভেসে এল বাইরে থেকে।

•

বীয়ারের থলিটা রঘুই বয়ে নিয়ে গেছিল দু-হাতে করে। কাঁচের দরজা খুলে ধরেছিল সুবিনয়। অন্য দিনে রাত নটায় দার্জিলিং ঘুমিয়ে পড়ে। আজ যে ইস্টার মানডে তাই ফুর্তির ফোয়ারা ছুটছে রাণী পার্বতে। এই সঙ্গে মিশেছে গোর্খাদের বিজয় অভিযান।

রাজনীতি-ফাজনীতির ধার ধারে না এরা দুজন। পয়সা এদের তপস্যা। পয়সার সঙ্গে ফাউ হিসেবে মেয়েমানুষ। রঘুর তাপসিক আকৃতি দেখে ভুল করে অনেকেই···

ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর গ্রে-গ্রীণ কালারের ভ্যানগার্ড ভ্যান। ধড়িবাজ রঘু জলের দরে কিনেছে গাড়িটা। আমেরিকান গাড়ি। ইঞ্জিন বাঘের মত। বডিটা একটু পাল্টে নিয়েছে। দুপাশের ধাতুর চাদর কেটে সেখানে বসিয়েছে কাঁচের জানলা।

ভ্যান ঘুরে ড্রাইভারের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রঘু। বীয়ারের বোঝা এক হাতে ব্যালেন্স করতে করতে আর এক হাত ঢোকায় প্যান্টের পকেটে। গাড়ির চাবিটা যে গেল কোথায়···

ডান পকেট থেকে হাত টেনে এনে বীয়ারের বোঝা বাহুবদল করে নিয়ে বাঁ পকেটে হাত ঢোকায় রঘু···

দূর থেকে বামাকণ্ঠে ডাকটা শোনা গেছিল তখুনি: বুলটি!

অন্যমনস্ক চোখে ব্লু-বট্‌ল পানাগারের নিওন-সাইনের দিকে চেয়ে থাকায় ডাকটা কানে আসেনি রঘুর।

এলে হয়তো কাহিনীটা হত অন্যরকম···

•

চন্দ্রলেখা নামছে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে।

এই সেই চন্দ্রলেখা যাকে দেখলে মুনি-ঋষিরও মতিভ্রম হয়। কামিনী-কাঞ্চন যাদের কাছে বিষবৎ, তাদেরকেও নরকের দ্বার দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে চন্দ্রলেখা।

এহেন চন্দ্রলেখা এই মুহূর্তে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে চলমান ম্যামীর মতই। আজ তার পরনে রঙ-ওঠা ব্লু-জিন্স-এর পাছা কামড়ে ধরা স্ন্যাক্স। টুকটুকে লাল পুলওভারটা বুকের পাহাড়ের ওপর চেপে বসা

তাকে ভয়ানক সেক্সি মনে হচ্ছে। এমনিতেই তার শরীরের খাঁজে খাঁজে পুরুষ-আকর্ষণের অদৃশ্য উপাদানটি একটু বেশি পরিমাণ প্রকট পায়। তার মদালসা চাহনি আর আশ্চর্য বাঁকা হাসি দেখলে বুকের মধ্যে রেলগাড়ি ছুটতে থাকে।

ঢালু পথ বেয়ে নামবার সময়ে আজ তার বরবর্ণিনী দেহ উথলি উথলি উঠে নীরব সঙ্কেতে আহ্বান জানিয়ে চলেছে পথচারীদের, এমনকি দোকানদার-দেরও। তার ঘন কালো চোখ আজ আরও অমানিশা-কালো মনে হচ্ছে। তার বয়কাট চুল ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে স্পষ্টই বিজ্ঞাপন জানিয়ে চলেছে আসলে সে কে—কি তার পেশা!

নিউজস্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়ার সময়ে ম্যাগাজিন কিনতে কিনতে জনৈক রুপোলী-কেশ প্রৌঢ় কুঞ্চিত-ললাটে জিজ্ঞেসও করেছিল দোকানদারকে—"কলগার্ল মনে হচ্ছে?"

মুচকি হেসে বলেছিল নেপালী দোকানদার—"হ্যাঁ। এখন আছে ব্লু বটলে —যাচ্ছে ওইখানেই।"

আর ঠিক তখনি চলমান মমীর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাকটা—"বুলটি!"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! চন্দ্রলেখা কলগার্ল। এই যৌবন আর এই রক্তমাংসের নশ্বর দেহটা তার বেঁচে থাকার মূলধন। জীবিকার একমাত্র উপায়। তাই তার ভুরুতে বিজুলি খেলে যায় হরবখৎ—চুম্বকের আকর্ষণ বিচ্ছুরিত হয় চোখের কালো মণি আর তন্বী দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে। ঈশ্বর তাকে যা দিয়েছেন, তা কাজে লাগানোর জন্যেই দিয়েছেন···ফেলে রাখার জন্যে নয়···

অথচ···এই মুহূর্তে···ঢালু পথ বেয়ে নেমে যেতে যেতে সে যেন কলগার্লের ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়। তার শরীর নেচে নেচে উঠছে ঠিকই—সেটা তার শরীরের গুণ বা দোষ···

নেচে উঠছে না চন্দ্রলেখার চিত্ত। এই মুহূর্তে তা স্থির···অবিচল···এবং অসাড়।

চক্ষুতারকায় কি তারই অভিব্যক্তি ঘটছে না? কোথায় সেই দামিনী ঝলক? চটুল চাহনি? দুর্জ্ঞেয় হাসি?

চন্দ্রলেখা কেন চলন্ত মমীর মত হেঁটে নেমে যাচ্ছে ঢালু পথ বেয়ে গ্রে-গ্রীণ রঙের ভ্যানগার্ড ভ্যানগাড়িটার দিকে?

চোখ তার সেইদিকেই। গাড়ির দিকে নয়। গাড়ির পায়ে দাঁড়িয়ে যে লোকটা একবার ডান পকেট হাতড়িয়ে আবার বাঁ পকেট হাতড়াচ্ছে চাবির সন্ধানে—চোখের প্রজাপতি-পাখনা কাঁপিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে চন্দ্রলেখা…

দেখছে…দেখছে…ঢালু পথ বেয়ে সমস্ত শরীর দুলিয়ে নামতে নামতে শুধু তার দিকেই সে চেয়ে আছে—

অর্জুন বুঝি লক্ষ্যভেদের আগে এইভাবেই চেয়ে থেকেছিল নিশানা বস্তুটির দিকে…!

বুল্‌টি ডাকটা চন্দ্রলেখার গলা থেকে বেরিয়ে গেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই : কলগার্ল চন্দ্রলেখা এই মুহূর্তে কর্তৃত্ব রাখতে পারছে না তার মনের ওপরেও…

গ্রে-গ্রীণ ভ্যানগার্ড এখন চন্দ্রলেখার ঠিক সামনে। ব্লু-বট্‌ল-এর নিওন-লাইনের রামধনু রঙ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণের হিল্লোল তুলে চলেছে। স্বৈরিণী চন্দ্রলেখা রাত নটায় হিমালয়ের আলো আঁধারে তিলোত্তমার মাধুরী নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছে রঘু রাহার সামনে…

আচমকা তার ওপর চোখ পড়েছিল রঘুর।

থ হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

বাঁ হাতটা তখনও ঢোকানো রয়েছে প্যাণ্টের বাঁ পকেটে—ডান বাহুতে ব্যালেন্স করছে প্ল্যাস্টিক থলির বারোখানা বীয়ারের বোতলকে।

তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে চন্দ্রলেখা। পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল নাকি ?

সেই রকমই নিশ্চয় মনে হয়েছিল রঘুর সেই মুহূর্তে। তাই বাক্য সরে নি মুখ দিয়ে। চোখের পাতাও পড়েনি, কেবল ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েছিল চক্ষু-তারকা। একটু উন্মুক্ত হয়ে গেছিল মুখবিবর। ওর পেটেণ্ট করা ছেলেমানুষী ভাবটা ফুটে উঠেছিল মুখের পরতে পরতে সুনিবিড় বিস্ময় বোধের মধ্যে—

চন্দ্রলেখার মুখটা আজ মোমের মত নরম অথচ পাথরের মত কঠিন—অথবা একেবারেই ভাবলেশহীন বলেই মনে হচ্ছে এমনটা। তার চোখে মুখে বুকে রঙ আছড়ে আছড়ে পড়ে অপার্থিব জগতের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে মত্ত হয়েছে—সে নিজে কিন্তু নির্বিকার—নিষ্কম্প—নিরুদ্বেগ—

বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সরু ফিতের নিচে ঝুলছিল কালো লেডীজ ব্যাগটা। মড়ার মত চোখ মেলে রঘুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কলের মানুষের মত

হাত বাড়িয়ে এই ব্যাগের বোতাম টিপল চন্দ্রলেখা। পীবর বুক একটুও না কাঁপিয়ে, নাকের পাটার হীরক-বিন্দুতে একটুও ঝলকানি না তুলে, ব্যাগের মধ্যে থেকে টেনে বের করল সে···

একটা কালো পিস্তল !

রঘু রাহা নিজেও কি ম্যমী হয়ে গেছে ? লোপ পেয়েছে কি তার চকিত চমক বোধের কেন্দ্র আর উপকেন্দ্রগুলো ? তবে সে কেন নড়ছে না, সরছে না, বা পকেট থেকে হাতটাকেও টেনে বের করছে না ?

সে কিন্তু চিনেছে আগ্নেয়াস্ত্রটাকে। বড় ভারী পিস্তল। আমেরিকার তৈরি। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলভার।

মিশমিশে কালো আর বেজায় ভারী মারণাস্ত্রটাকে যেন কায়দায় আনতে পারছে না চন্দ্রলেখা, এমনিভাবে হাত বদল করল পর-পর দু'বার। ফ্যাল ফ্যাল করে তা দেখেই যাচ্ছে রঘু রাহা। চেম্বারের ঠিক ওপরে টানা লম্বা ধাতুর পটিটায় 'ইউনাইটেড স্টেট্স প্রপ্রাটি' লেখাটাও পড়া হয়ে গেল রামধনু রঙের ঝিলিকের মধ্যে। ব্যারেলে লেখা 'স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন' লেখাটা চোখ এড়ালো না। কাঠের হাতলের পিনটা পর্যন্ত কেন যে খুঁটিয়ে দেখে নিল রঘু রাহা, তা জানে কেবল রঘু রাহা-ই···

অথবা, জানত রঘু রাহা···

কারণ, ইস্পাতের ভারী টুকরোটাকে ডান হাতের মুঠোয় এতক্ষণে চেপে ধরেছিল চন্দ্রলেখা এবং নলচে স্থির করেছিল রঘু রাহার বুকের দিকে।

অকস্মাৎ পাল্টে গেল দৃশ্যটা !

যাদুমন্ত্রবলে বুঝি প্রাণের সঞ্চার ঘটল রঘু রাহার নিস্পন্দ দেহের প্রতিটি মাংসপেশীতে—নিমেষে উত্তাল উদ্বেল হয়ে উঠল মস্তিষ্কের লক্ষকোটি স্নায়ু—চকিতে নির্দেশ ধেয়ে গেল হাজার হাজার স্নায়ুপথে।

প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটে গেল এক অনুপলের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যেই···

ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মতই রঘু রাহা ছিটকে গেছিল ড্যান-গার্ডের পেছন দিক লক্ষ্য করে, কিন্তু তার আগেই যে পর-পর দু-বার গর্জে উঠল স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের মারণাস্ত্র···পর-পর দুটো সিসের গুলি ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তার গায়ে বিঁধে না গেলে সে কেন অমনভাবে সমস্ত শরীরটাকে পিঠের

দিকে বেঁকিয়ে ফেলেছিল আচমকা ? আর কেনই বা পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়েছিল গ্রে-গ্রীণ ভ্যানগার্ডের গায়ে ?

আর তার পরেই বিষম দিশেহারা হয়ে, দুই চক্ষুকে বিকট প্রকট করে সে ছিটকে গেছিল বন্ধুবর সুবিনয়ের দিকে—বাঁচবার ঝলক প্রচেষ্টায় !

কি করছিল তখন সুবিনয় ?

আগাগোড়া সে দেখেছে এবং পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকেছে। তার চক্ষু অস্বাভাবিক বিস্ফারিত হয়েছে—কিন্তু হাত-পা আশ্চর্য ভাবে অসাড় হয়ে গেছে।

তাই সে মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও হিমালয়ের আলো-আঁধারিতে প্রত্যক্ষ করেছে বরফ-ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালনা···

নিজেও বরফ-জমা তনুমন নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে পল···বিপল···অনুপল···

হিমালয়ের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটাতেও এমনটা হতে পারে। অণু-পরমাণুকে অবশ করে তুলতে পারে। তাই গলা ফাটিয়ে যখন আর্তনাদ করে উঠেছিল রঘু রাহা, তখনও তার সম্বিৎ ফেরেনি। সহসা রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য নাটক দেখার বিহ্বলতায় মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

গলা চিরে চেঁচিয়েছিল রঘু—"সুবিনয় !"

সুবিনয় নিশ্চুপ। পাথর।

হিমেল কণ্ঠে হিমালয়-কন্যাদের মতই গর্জে উঠেছিল চন্দ্রলেখা—"তফাৎ যাও, সুবিনয় !"

সুবিনয় তফাতেও যায় নি, কাছেও আসেনি।

সে শুধু দেখছিল, দু-হাত সামনে ব্যাকুল ভাবে তার দিকে বাড়িয়ে যখন ধেয়ে আসছে রঘু, মিশরের মমীর মত অথবা রূপসী পিশাচিনীর মত চন্দ্রলেখা মেপে মেপে পা ফেলে তার পেছন পেছন আসছে এবং হিমেল হিমালয় কণ্ঠে গর্জে উঠেই তর্জনী দিয়ে টান মেরেছে ট্রিগারে আর একবার···

আর একটা বুলেট রাণী-পর্বতকে শিউরে দিয়ে ঠাঁই নিয়েছে রঘুর দেহ-মন্দিরের কোনো এক অঞ্চলে এবং তৎক্ষণাৎ নিঃসীম যাতনায় পাকসাট খেয়ে আবার ভ্যানগার্ডের গায়ে আছড়ে পড়েছে রঘু।

কী আশ্চর্য ! বীয়ারের বোতল ভর্তি প্লাষ্টিক থলি কিন্তু সে এখনও আঁকড়ে আছে ডান বাহু দিয়ে বুকের ওপর।

চন্দ্রলেখা আবার ফিরেছে তার দিকে। হিমালয়-নন্দিনী চন্দ্রলেখা। অসুর

নিধনের নিষ্ঠুর সঙ্কল্প নিরেট হয়ে বসে গেছে তার নিটোল চোখে মুখে···

আবার আগুনের ঝলক ঠিকরে আসে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের নলচে থেকে···

ঠাস করে ভেঙে যায় একটা বীয়ারের বোতল—রক্ত আর বীয়ারের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে গ্রে-গ্রীণ ভ্যানগার্ডের গা বেয়ে—

কেঁপে গেছে রঘু···ঝটকান মেরে মেরে গড়িয়ে যাচ্ছে ভ্যানগার্ডের গা দিয়ে দিয়ে·· পৌঁছে গেছে গাড়ির পেছনে।

হিমালয়-তনয়াও মেপে মেপে পা ফেলে ফেলে পৌঁছেছে সেখানে। পাকসাট দেওয়া শুরু হতে না হতেই ট্রিগারে তর্জনীর টান দেয় আর একবার।

এবার ছিটকে যায় রঘু। গাড়ির গা থেকে সামনের পান-সিগারেটের দোকানটার দিকে। মুখ থুবড়ে গোটা দেহটা দমাস করে আছড়ে পড়ে ফুটপাতে। সশব্দে গুঁড়িয়ে যায় বুকে চেপে ধরা বীয়ারের সব কটা বোতল।

দু-পা এগিয়ে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনকে নিস্পন্দ দেহটার দিকে স্থির রেখে পরের পর ট্রিগার টিপে যায় চন্দ্রলেখা। ছটা চেম্বারের সব কটা ঘর খালি হয়ে যাওয়ার পর খট-খট করে আওয়াজ হতেই শুরু হয় বটে—রিভলভার কিন্তু নামায় না হাত থেকে।

রুধির আর বীয়ার মিলে মিশে গল্‌গল্‌ করে তখন গড়িয়ে যাচ্ছে ফুটপাতের পাথর বেয়ে।

অদূরে অনুনাসিক স্বরে অবিরাম চেঁচিয়ে যাচ্ছে এক মহিলা—লক্ষ্যভ্রষ্ট একটি গরম গুলি তার বুড়ো আঙুল উড়িয়ে নিয়ে গেছে। টুকটুকে লাল রোল্‌স-রয়স এম্‌পেরর গাড়ি থেকে নেমে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে গেছিলেন ব্লু-বট্‌ল প্রমোদাগারে। এয়ারকণ্ডিশনড গাড়ির মধ্যে বসে থেকে শুনতে পাননি। গুলির পর গুলি বর্ষিত হচ্ছে পানাগারের সামনেই। আচমকা একটা বুলেট উড়ে এসে উধাও করে দিয়েছে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

অতএব তিনি তাঁর প্রাণঘাতী চিৎকার দিয়ে শিহরিত করে চলেছেন গোটা হিমালয় পর্বতকে।

রক্ত-জল-করা এই চিৎকারও চন্দ্রলেখার কান দিয়ে ঢুকে মগজে কোনো সাড়া জাগাচ্ছে না। এক হাতে ভারী মারণাস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে তখনও সে প্রশান্ত প্রসন্ন চোখে চেয়ে আছে সপ্ত-গতায়ু রঘু রাহার দেহপিঞ্জরের দিকে।

এতগুলো গুলির আওয়াজ ব্লু-বট্‌লের উদ্দাম বাজনা ছাপিয়ে যাদের

"গাড়ি চলেছে ঠিক সেই সময়ে—চালিয়েছেন ইনি," চন্দ্রলেখাকে দেখায় কাঞ্চনবাবু।

"চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা!" কথা আটকে যায় রতনের। "তুমি!"

চন্দ্রলেখার চোখ-মুখের প্রসন্নতা এখন অবর্ণনীয়।

হুড়মুড় করে সবাই বেরিয়ে আসছে ব্লু-বটল থেকে। তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে আঙুল হারা রমণী। বিরক্তি মাখা চোখে সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বকে যাচ্ছে আস্তিক লাহা—"পাগল! মাথা খারাপ! কেন যে এত চেঁচায়।"

কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী বললেন চন্দ্রলেখাকে—"আসুন আমার সঙ্গে।"

একটি কথাও না বলে পা বাড়ায় চন্দ্রলেখা।

ভ্যানগার্ডের পাশ দিয়ে গিয়ে ওঠে ল্যাণ্ডরোভার গাড়িটায়—কাঞ্চনবাবুই দরজা খুলে দেয়। নিজে ওঠবার আগে তাকায় আরও কাউকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যে। বিধ্বস্ত দেহে তখনও দাঁড়িয়ে সুবিনয়।

এগিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলে কাঞ্চনবাবু। ঠিক এই সময়ে আস্তিক লাহার দুই পায়ে যেন বিদ্যুৎ গতি সঞ্চারিত হয়। ত্বরিৎ পদে ছুটে এসে বলে ওঠে—"সাক্ষাৎ মা দুর্গা! দুটো ছবি আঁকতে চাই। যাবো সঙ্গে?"

আবলুস-দেহীর কণ্ঠে যেন শাঁখ বেজে ওঠে তৎক্ষণাৎ—"আজ্ঞে না। হাঁটুন।"

"হাঁটব?"

"ও-কাজটা এখনও হয়নি। পাহাড় কেন উঁচুনিচু, মরুভূমি কেন নয়—এ প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন?"

"না—না।"

"হাঁটুন। মেপে মেপে হাঁটুন। পেয়ে যাবেন।"

খটাং করে বন্ধ হয়ে গেল ল্যাণ্ডরোভারের দরজা। ধোঁয়া উড়িয়ে সামনে গিয়েই বাঁক নিল বাঁ পাশে। পেছনে লেখাটা দেখা গেল তখনি—পুলিশ।

*

কাঞ্চীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখা গেল এই সময়ে।

হেঁকে হেঁকে সবাইকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলে ব্লু-বটল-এর মধ্যে। রতন কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল পানের দোকানের সামনে। তার পায়ের কাছে রক্ত,

কাঁপছে রতন সামন্ত। গোর্খাদের অনেক কাণ্ড সে দেখেছে—কিন্তু এহেন ব্যাপার নিশ্চয় কখনো দেখেনি।

পান-সিগারেটের দোকানদার বাহাদুর বসে ওঠে চোখ বড় বড় করে—"মেয়েটা কি পাগল?"

ফোড়ন দিয়ে বলে ওঠে আস্তিক সাহা—"দূর! পাগল হবে কেন? সাপ—সাপ! ছোবল মারল ছপাং…ছপাং…"

"রিভলভার ধরতেও জানে না," বাহাদুরের মন্তব্য।

"স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন ধরা এত সোজা নয়," বিড় বিড় করে বললে রতন সামন্ত।

"ডেডবডি কি পড়ে থাকবে? ভিড় জমে যাচ্ছে যে!"

"কাঞ্চনবাবুই ব্যবস্থা করবেন," বললে রতন। বলেই সাঁৎ করে ঢুকে গেল ব্লু-বটলে।

একটু পরেই অ্যামবুলেন্স এসে নিয়ে গেল রঘুর লাশ।

*

আস্তিক সাহা তখন পা মেপে মেপে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উঠছে। ব্লু-বটল থেকে তার হোটেল পর্যন্ত তিনশ তিরানব্বই পা—আসবার সময়ে মেপে মেপে নেমেছে। রোজই তাই থাকে। তবুও সন্দেহ হয় সাহা মশাইয়ের। ঠাণ্ডায় যে কোন জিনিস ছোট হয়ে যায়, গরমে বেড়ে যায়। পাহাড়ি রাস্তাটাও ছোট হচ্ছে না বড় হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বইকি। সূর্যের গরমে গোটা পৃথিবীটাও বেড়ে যায় কিনা—এটা নিয়েও মাঝে মাঝে ভাবনা গজগজ করে আস্তিকবাবুর উর্বর মাথায়…

নিউজস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত দিব্বি উঠেছিল, মাপে কোন গোলমাল হয়নি। দোকানদার ওকে দেখেই ফিক করে হেসে বললে—"কি স্যার, মাপ ঠিক আছে তো?"

"কেন? বেঠিক হবে কেন?"

"যা গুলি গোলা চলছে। মেয়েটা যখন নেমে গেল এখান দিয়ে, কে বলবে গুলি চালাতে যাচ্ছে—"

"এল কোত্থেকে?"

"কে জানে—কি হ'ল? আবার নেমে যাচ্ছেন কেন? হিসেব গুলিয়ে গেল?"

"কথা বলে গুলিয়ে দিয়ে আবার ন্যাকামি হচ্ছে!" গজগজ করতে করতে রাত সাড়ে নটার হিমেল হিমালয়ের সর্পিল পথ বেয়ে নেমে যায় আস্তিক দাহা ব্লু-বটল অভিমুখে।

•

ঠিক তার আগেই পথে নেমেছে রতন সামন্ত। ঠাণ্ডা আটকানোর জন্যে কালো রঙের ওভারকোট দিয়ে সারা গা ঢেকেছে—কলার উঁচু করে দিয়ে কান আর মুখের কিছুটাও ঢেকে নিয়েছে। মাথায় ফেল্টক্যাপ। দূর থেকে কেন, কাছ থেকে দেখলেও তাকে এখন চেনা মুশকিল।

ঢালু পথ বেয়ে গজগজ করে বকতে বকতে কিছুটা নেমেই আবার কি খেয়াল হল আস্তিক দাহার—থমকে দাঁড়াল।

লাইনের তলা দিয়ে ওপাশের ঢালু পথ বেয়ে নিচের গ্রামের দিকে চলেছে রতন সামন্ত। এদিকে আলো কম—গাছের অন্ধকার বেশি। বড় বেশি নির্জন।

মাথা নাড়তে নাড়তে পাগল শিল্পী পা বাড়ায় এই পথেই।

দূরে বাঁক ঘুরে তখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রতন সামন্তর ওভারকোট আচ্ছাদিত মূর্তি।

•

এই দার্জিলিং বড় অশান্তি নিয়ে থেকেছে দু-দুটো বছর। আইনরক্ষকরা হিমসিম খেয়ে গেছেন। নির্দিষ্ট এলাকায় এখন তাঁরা অফিস গুছিয়ে রেখে দিলেও, নানা জায়গায় ঘাঁটি রেখে দিয়েছেন অলক্ষ্যে কানুনকে জোরদার করবার জন্যে।

এইরকমই একটা বাড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে চন্দ্রলেখা আর কাঞ্চনবাবুকে। দীর্ঘদেহী এই কালো মানুষটার সঠিক পরিচয় কেউই জানে না। পুলিশের লোক এইটাই জানে অনেকে। ল্যাণ্ডরোভার গাড়িতেই যে সেই বিজ্ঞাপন।

এ ঘরে এখন আর কেউ নেই। সুবিনয়কে কাঞ্চনবাবু রেখে এসেছে অন্য জায়গায়।

চন্দ্রলেখা চুপ করে বসে। মুখে নেই ভাবান্তর।

কাঞ্চনবাবু পাইপ ধরিয়েছে। নীরবে তাম্রকূট সেবন করছে। বিস্তর ধূম্রজাল রচনা করেছে।

এবার প্রশ্ন করল—"রাত এখন দশটা। কোথায় যাবেন?"

"বাড়িতে।" যেন বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসে চন্দ্রলেখার কণ্ঠস্বর।

"কে আছে বাড়িতে?"

"আমার ছেলে।"

"কত বয়স?"

"দশ।"

"একলা রেখে এসেছেন?"

"একলাই থাকে।"

"আর কে আছে আপনার?"

"কেউ না।"

"স্বামী?"

"ডিভোর্স করেছি।"

"বেশ করেছেন। বয়স কত আপনার?"

"আটাশ।"

"এ লাইনে কতদিন?"

"যেদিন আমার পেটে ছেলে এনে দিয়ে সে পালায়।"

"এই যে বললেন ডিভোর্স করেছেন?"

"এ সে নয়, আর একজন।"

"আর একজন! সে আবার কে?"

"একজন আমেরিকান। সিলভেস্টার তার নাম।"

"সে কি করেছিল?"

"আমার পেটে বাচ্চা এনে দিয়েছিল। এই দার্জিলিং-এ আমি জন্মেছি। এখানেই মানুষ হয়েছি। বাবা আর মা এখানেই মারা যান। সেই বাড়িতেই আমি থেকেছি আর স্কুলে পড়িয়েছি। তারপর এল সিলভেস্টার। টুরিস্ট। আমার সর্বনাশ করে দিয়ে চলে গেল।"

"তখন আপনার বয়স কত?"

"ষোল।"

"পেটের ছেলেটা?"

"আছে এই দার্জিলিং-এ। অরফ্যান হোমে।"

"ও। একটা ছেলেকে অনাথ করেছেন—আর একটাকে কাছে রেখেছেন।"

565

"কাছে রেখেই ভুল করেছি।"

"কেন?"

"ওর সামনেই সব হয়। একই ঘরে ব্যবসা আর থাকা।"

"খুন করলেন কেন?"

"বুলটিকে? ওকে ভালবাসতাম বলে, ঘেন্নাও করতাম।"

"ঘেন্না করতেন কেন?"

"যে বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে, তার বাচ্চার স্যানি-র সঙ্গে মজেছে।"

"আপনি দেখেছেন?"

"গত দুদিন ধরে সেখানে আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। রাতেও দরজা বন্ধ করে রাখে।"

"ভেতরে ঢোকেন নি—অথচ সব জেনে বসে আছেন?"

"বাইরে থেকে সব শোনা যায়।"

পাইপের তামাক নিভে গেছে। ফের ধরিয়ে নেয় কাঞ্চনবাবু—ভালও তো বাসতেন বুলটিকে।"

"খুবই। ওর ছেলেকেও পেটে ধরেছিলাম। খসিয়েছি। আর নয়।"

"কেন?"

"বিয়ে আর নয়। ও ক্ষেপে গিয়ে স্যানির সঙ্গে ভিড়ে গেল।"

"আর তাইতেই আপনি ক্ষেপে গেলেন?"

"ও কলকাতায় কাকে নিয়ে থাকে, আমার জানার দরকার নেই। এখানে তা চলবে না। আমার কাছে শুলে পয়সা যখন নিই না—"

"তাই বলে খুন করবেন?"

"আবার করব।"

"আর করতে হবে না। বুলটি খতম হয়ে গেছে। রিভলভার পেলেন কোত্থেকে?"

"সিলভেস্টার দিয়ে গেছিল।"

"বারো বছর ধরে রিভলভার কাছে রেখেছেন?"

"কলগার্ল যে—তৈরি থাকতে হয়।"

"বারো বছরে ফায়ারিং প্র্যাকটিস করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"গুলি পেলেন কোথায় ?"

"সিলভেস্টার দিয়ে গেছিল।"

"সিলভেস্টার ফিরে এলে ফেরৎ দিতেন ?"

"গুলিগুলো দিতাম—বুকের ভেতরে।"

"আপনি কিন্তু এখনও আনাড়ি। রিভলভার ধরতে জানেন না—আমি দেখেছি। গুলি চালাতেও জানেন না—এক ভদ্রমহিলার আঙুল উড়িয়ে এলেন এখুনি।"

"তাই নাকি ?"

"চিৎকার শোনেন নি ?"

"না।"

"রিভলভার আপনি চালাতে জানেন না—অথচ বলছেন, প্র্যাকটিস করেছেন বারো বছর ধরে।"

"যা বলছি, সত্যিই বলছি।"

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে। সাদা শাল সামলাতে সামলাতে ঘরে ঢুকল আস্তিক লাহা।

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে—"না না, চন্দ্রলেখা। তুমি মিথ্যে বলছ।"

"আপনি!" সচমকে তাকায় চন্দ্রলেখা। পাথর মূর্তিতে প্রাণ এসেছে এতক্ষণে—"আপনাকে অনেকদিন ধরেই দেখছি ব্লু-বটল-এ। আপনি পাগল।"

"পাগল তো বটেই," দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে আস্তিক লাহা—"মেয়েগুলো সব সাপ। তুমি যেমন। কিন্তু রিভলভারটা সিলভেস্টারের নয়।"

"তবে কার ?"

"যাদের হয়ে তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে ফায়ারআর্মস সাপ্লাই দিতে।"

"মানে ?"

"চন্দ্রলেখা, এই দার্জিলিং সন্ত্রাসের রাজত্ব হয়ে ওঠা ইস্তক এখানে অবাধে গুলি গোলা বন্দুক চালান এসেছে বাইরে থেকে। সাপ্লাই সেন্টারটা এই কদিনে পেয়েছি—ব্লু-বটল। সাপ্লাই হয় তোমার হাত দিয়ে—কলগার্ল হিসেবে যেখানে খুশি যেতে পারো—যে কোনো লোকের সঙ্গে রাত কাটাতে পারো।"

"মিথ্যে কথা," ফোঁস করে ওঠে চন্দ্রলেখা।"

"রতন সামন্ত তোমাকে দিয়েছে এই রিভলভার।"

"মিথ্যে কথা!"

"চন্দ্রলেখা, তুমি যখন গুলি চালাচ্ছো, রতন তখন বীয়ার আনতে পাতাল ঘরে ঢুকেছিল—আমি দেখেছি। তোমার রিভলভার যখন কাঞ্চনবাবুর পকেটে এবং উনি যখন ল্যাণ্ডরোভারে—তখন রতন সামন্ত বলেছে নিজের মনে— স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন ধরা এত সোজা নয়। কিন্তু রিভলভার না দেখে সে বলে কি করে মেকার-এর নাম?"

"তাতে প্রমাণিত হয় না রিভলভারটা সিলভেস্টারের নয়।"

"চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা! আমি পাগল···পাগল বলেই এই ঘড়ি-ক্যামেরা দিয়ে ব্লু-বটলের কত ছবি যে তুলেছি তা তুমিও জানো না।" মণিবন্ধের ঝকমকে রিস্টওয়াচটা দেখায় আস্তিক লাহা—"আমি যে দেখেছি এবং ফটো তুলেও রেখেছি, আজ রাত ঠিক সাড়ে সাতটায় সময়ে রতন সামন্ত তোমাকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন দিয়েছে কাউন্টারের ওপর দিয়ে—ব্যাগে পুরেই তুমি বেরিয়ে গেলে ডেলিভারী দিতে। কিন্তু ডেলিভারী না দিয়ে তুমি ওৎ পেতে ছিলে রঘুর বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায়।"

চাপা গলায় গর্জে ওঠে চন্দ্রলেখা—"বীয়ার নিতে এসেছিল জানিকে নিয়ে ফুর্তি করবে বলে।"

"তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট রঘু—কেন এত রাগ তার ওপর?"

"সে আপনি বুঝবেন না। পাগল কোথাকার! কিন্তু সত্যিই কি আপনি পাগল? কে আপনি?"

"আমি? লোকে আমাকে পাগলা ডিটেকটিভ বলে। বাবা-মা নাম দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র," দাড়ির জঙ্গল গাল থেকে টেনে নামাতে নামাতে বললে ইন্দ্রনাথ—"এই পাহাড়ে খুনোখুনি একেবারে বন্ধ করতে হলে আর্মস সাপ্লাই বন্ধ করার দরকার। তাই এসেছিলাম সরকারকে সাহায্য করতে।—কাঞ্চনবাবু, এবার তা বন্ধ হবে।"

কাঞ্চনবাবু গম্ভীর মুখে পাইপ টেনেই যাচ্ছিল। মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললে—"পা মেপে মেপে হেঁটে কি দেখে এলেন?"

"রতন সামন্ত নেমে গিয়ে খবর দিল গ্রামের হেড কোয়ার্টারে। এখুনি খতম করা দরকার চন্দ্রলেখাকে। সে রিভলভার ডেলিভারী না দিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে। পুলিশকে ফাঁস করে দিতে পারে সব কথা।"

পাইপ নামিয়ে সবেগে উঠে দাঁড়াল কাঞ্চনবাবু।

মাথার লম্বা চুলের পরচুলা আর চোখের নীল চশমা খুলতে খুলতে স্মিত মুখে বললে ইন্দ্রনাথ—"তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! সব ব্যবস্থা করেই এসেছি। ওরা ফাঁদে পা দিতে আসছে।"

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই যেন বাজির গুদোমে আগুন লেগে যাওয়ার মত দুমদাম আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। চেঁচামেচি। হট্টগোল। এক-নাগাড়ে গুলিবর্ষণ।

চন্দ্রলেখার মুখ রক্তহীন।

কাঞ্চনবাবু আবার পাইপ তুলে নিয়েছে।

নস্যির ডিবে বের করেছে ইন্দ্রনাথ।

মিনিট কয়েক পরেই অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ ধ্বনিত হল বাইরের অন্ধকার বারান্দায়।

কোনগোড়া থেকে ভেসে এল পুরুষ কণ্ঠস্বর—"স্যার, রতন সামন্ত ছাড়া—জ্যান্ত ধরা গেল না।"

ঘরের ভেতর থেকেই ধীর স্থির গলায় বললে কাঞ্চনবাবু—"ওদের হেড-কোয়ার্টার আর সাপ্লাই সেন্টার?"

"সার্চ চলছে দু জায়গাতেই।"

"এখানে কারা এসেছিল?"

"রতন, ভিমু আর আবদুল—তিন লীডার। তিনজনেই এখন যমালয়ে।"

"গুডনাইট।"

"গুডনাইট।"

চন্দ্রলেখার নিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে স্নেহাক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে ইন্দ্রনাথ—"পেয়ারা গাছ কেন বেঁটে, সুপুরি গাছ কেন লম্বা? মেয়েরা কখনও দেবী, কখনও কেন দানবী?"